## প্রথম অধ্যায়

# চণ্ডীদেবীর স্বরূপ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা

**চণ্ডীদেবীর স্বরূপ :**

দেবী পূজার প্রচলন ভারতে বৈদিক সভ্যতার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। বৈদিক সমাজেও শক্তি পূজা প্রচলিত ছিল। আদিরূপে দেবী মাতা পৃথিবী। আবার ঋগ্বেদের প্রথম, ষষ্ঠ ও দশম মণ্ডলেও পৃথিবী মাতার বন্দনা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পৃথিবীকে 'শ্রী' বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে 'শ্রী'র সঙ্গে অভিন্ন রূপেই লক্ষ্মীর বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে 'বাল্মীকি রামায়ণে' পৃথিবী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও কালিকাপুরাণসহ বিভিন্ন পুরাণেও ধরিত্রী মাতার কথা পাওয়া যায়। ইনি পরবর্তীকালে পৌরাণিক যুগে জগদ্ধাত্রী রূপে বন্দিতা হন। তবে বাজসনেয়ী সংহিতায় দেবী অম্বিকাকে শিবের ভগ্নীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্ল যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে সম্ভবত সর্বপ্রথম অম্বিকাকে শিবের পত্নী রূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়। এখানেই প্রথম দেবীকে দুর্গা- বৈরোচনী, কাত্যায়নী এবং কন্যাকুমারী নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার যজুর্বেদেই প্রথম তন্ত্র সাধনার উল্লেখ আছে, যেখানে দেবী ভদ্রকালী, ভবানী ও দুর্গা নামে পরিচিতি লাভ করলেন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন— ''অন্যান্য নামে দেবী চরিত্র থাকিলেও বৈদিক সংহিতায় চণ্ডী নাম নাই, রামায়ণ-মহাভারত কিম্বা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখমাত্র নাই। অর্বাচীন কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে এই দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আর্যেতর কোনও সমাজ হইতে উদ্ধৃত হইয়া নামটি কালক্রমে পূর্ব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।''[১]

শিক্ষিত জনের মনে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রথমে ইউরোপীয় চেতনার অনুগামী হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক তথা আর্য সভ্যতার পাশাপাশি অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ দেখা গেছে। এই সভ্যতা উত্তর ভারতের

পশ্চিমাঞ্চল থেকে বিস্তৃত হয়ে পূর্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলায় প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ও প্রত্নলিপির উপর নির্ভর করে দীনেশচন্দ্র সরকারও বাংলায় 'আর্যীকরণ' -এর বিবরণ দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সমালোচক বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে শক্তিবর্গীয় দেবী মাত্রই অনার্য বলে দাবি করেছেন এবং আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে এই পশ্চিমবঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল বলে মনে করেছেন।

বাংলার আর্য ও অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ যে খুবই দীর্ঘ ও ব্যাপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবুও তা প্রমাণসাপেক্ষ। চণ্ডী কেবলমাত্র অনার্য সংস্কৃতি প্রসূত নন, এই দেবী সত্তায় আর্য সংস্কৃতির মিশ্রণও আছে অর্থাৎ আজকের যে দেবী চণ্ডী এই আর্য ও অনার্য দেবীসত্তার মিশ্রণেই গঠিত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে চণ্ডী শব্দটি অর্বাচনী-সংস্কৃত অর্থাৎ কোনো অনার্য ভাষা থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থানলাভ করেছে। কেউ কেউ অনুমান করেন শব্দটি মুণ্ডা ভাষা থেকে আগত। মুণ্ডা জাতি ভুক্ত ওরাওঁ প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়। ওরাওঁ জাতির দেবী চাণ্ডী যে মূলত একই দেবতা এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপাস্য রূপে মাতৃশক্তির পরিমাপহীন উত্তুঙ্গতা এবং বিস্তার সম্পর্কিত চেতনা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য সাধারণ অঙ্গরূপে স্বীকৃত আছে। এই মাতৃশক্তির উপাসনার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে পরিব্যক্ত হলেও এই চেতনা, উপাসনা এবং সাধন ঘটিত ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপনে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। এই উপলব্ধি এবং চেতনাসাধন ও ক্রিয়াকলাপই 'তন্ত্র' আখ্যায় পরিচিত। অবশ্য পুরুষ দেবতা শিব এবং বিষ্ণুর সাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের ব্যবহারিকতা আছে কিন্তু 'তন্ত্র' প্রধানত দেবীর সাধন মার্গেরই পরিচায়ক। তন্ত্রের অভ্যন্তরীণ রহস্য এবং এই সাধন পদ্ধতির উদ্ভব ও প্রসার সম্পর্কিত তত্ত্ব ইতিহাসের আলোচনায় অতি বিস্তৃত। এ বিষয়ে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের জন্য আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রচলিত তন্ত্রশাস্ত্রের প্রধান আকর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অঙ্গরূপে সংকলিত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে গ্রন্থ ও সেই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট দেবী চণ্ডী সম্পর্কে কাব্য বাংলায় 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে পরিচিতি লাভ করে। আশুতোষ ভট্টাচার্য আর্য সমাজের গৃহীত শ্রীশ্রীচণ্ডীকে অনার্য মুণ্ডারিক ভাষাভিত্তিক ওরাওঁ নামে আদিবাসী সমাজের প্রচলিত 'চাণ্ডী' বলেই মনে করেছেন। আর্য-অনার্য তত্ত্বটি

ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশবাদী পাণ্ডিত্যের বর্হিপ্রকাশ। পণ্ডিত ম্যাকস্‌মুলার প্রবর্তিত এই তত্ত্ব ভারতীয় সমাজে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় চেতনায় তা তেমন খতিয়ে দেখা হয়নি। এই তত্ত্বটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সাযুজ্যের ভিত্তিতে ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষিত মহলে ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয়দের আর্যত্বের অভিমান প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। এরপর থেকেই শিক্ষিত ভারতীয়দের চেতনা ও রচনায় নিজেদের 'আর্য' বলে মননের প্রবণতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ম্যাকস্‌মুলার সেই 'আর্য শব্দকে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহারের জন্য এরিয়ান (Aryan) এই শব্দের প্রবর্তন করেন। এই (Aryan) তত্ত্বের দ্বারাই আমরা আর্যত্ব অর্জন করেছি বলা যেতে পারে।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হয়। এই অ-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীগুলির নাড়ি-নক্ষত্রের অন্বেষণে নর-তত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি (Anthropology) ও জাতিতত্ত্ব (Ethnology) নামে বিজ্ঞান বা অন্বেষার উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে এই নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বিপুল ভারতীয়দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জাগ্রত করতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে প্রসারিত করেছিল। এই নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানই সেই অতিমনোহর আর্য-অনার্যতত্ত্ব, বহু বিস্তৃত মনুর বর্ণসংকর তত্ত্ব, বৃহদ্ধর্মপুরাণের জাতিভেদ তত্ত্ব ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতামূলক বহু তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করে ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনাকে সঞ্চারিত করেছিল। সেই ভিত্তিতেই ঋগ্বেদানুযায়ী তিন বেদে অপ্রাপ্তব্য, যেমন অথর্ববেদের শিব এবং বাজসনেয়ী সংহিতা বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অম্বিকা, উমা, কাত্যায়নী-হৈমবতী-কন্যাকুমারিকা, গণেশ, নন্দী, কার্তিকেয় ইত্যাদি শিব-সান্নিধ্যস্পৃষ্ট সমস্ত পৌরাণিক দেব-দেবীই অনার্য সমাজ-সম্ভূত বলে ধার্য করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একসময় পুরুষোত্তম রূপে বৈদিক এবং লৌকিক এই দুই পরস্পর বিবাদমান জনগোষ্ঠীর সমন্বয় এবং মিলনের বার্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখনও অথর্ববেদের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'রুদ্রানাং শঙ্কর চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষাসাম' (গীতা, ১০/২৩) এই অভিজ্ঞান দিয়ে তিনি শঙ্কর নামীয় রুদ্র-শিবের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এই মিলনের পূর্ণ সার্থকতা যাজ্ঞবল্ক্যের বৈপ্লবিক সংযোজন শুক্লযজুবেদের তথা বাজসনেয়ী সংহিতার প্রবর্তনের পূর্বে হয়নি। ভগবদগীতার দশম অধ্যায়ে 'বিভূতি যোগে' সেই ভারতচেতনা সম্ভূত তত্ত্ব সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিভূতিযোগ

পর্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঋগ্বেদে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু, ইন্দ্র এই দুই দেবতার সঙ্গে শঙ্কর নামা রুদ্র, যক্ষরাজ 'বিত্তেশ' অর্থাৎ কুবের, পর্বতরাজ মেরু স্কন্দ কার্তিকেয়, অশ্বত্থবৃক্ষ, গন্ধর্ব চিত্ররথ, নিরীশ্বর কপিলমুনি, অশ্ব, হস্তী (ঐরাবত), গাভী (কামধেনু), সর্প (বাসুকী), নাগ (অনন্ত), পিতৃ (যম অথবা অর্যমা), দৈত্য বা অসুর (প্রহ্লাদ), নদী (জাহ্নবী) ইত্যাদি অবৈদিক জনগোষ্ঠী উপাস্য হস্তী, অশ্ব, পক্ষী সিংহ ইত্যাদি লোকসমাজের দ্বারা স্বীকৃত সকল উপাস্যকেই স্বীকৃতি প্রদান করে ভারতীয় সমাজ এবং ভারতের উদ্ভুত মনন-চিন্তনকে সংস্কৃতিরূপে, প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সমাজে আর্য-অনার্য, বিষ্ণু তথা শিব, কুবের ইত্যাদি অথর্ববেদীয় দেবতা, বিভিন্ন ধরনের পশু-পক্ষী, জলচর, বৃক্ষ-পর্বত ইত্যাদির উপাসকদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সমাজ সমান মর্যাদা দিয়ে প্রস্তর খণ্ডকে শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গ, ষাড়কে শিবের বৃষ, হনুমানকে - রামচন্দ্রের হনুমান রূপে উপাস্য দেবতা ন্যায় গ্রহণ করেছেন।

ম্যাক্সমুলার প্রবর্তিত আর্যতত্ত্বের স্বীকৃতির পর থেকেই এই 'আর্য-অনার্য' বিন্যাস নিয়ে বহু বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলে চণ্ডী— মঙ্গলচণ্ডী, বিক্রমচণ্ডী, জয়চণ্ডী, শুভচণ্ডী ইত্যাদি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিবিধ পণ্ডিতদের মতে চণ্ডী অনার্য সমাজ সম্ভূত। নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের দ্বারা 'আর্যতত্ত্বে' বিশেষ করে গুরুত্ব আরোপের পর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পতঞ্জলিকৃত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্যে ভগবান শিব ও শিববর্গীয় দেবতাদের লৌকিক পরিচয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু তিনি লৌকিক সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ঔৎসুক্য অন্বেষণ বা প্রকাশ করেননি। মহাভারতের অর্জুনের আর্যাস্তুতি এবং শ্রীদুর্গার আর্যা আখ্যান ব্যাখ্যায় তিনি দেবীর অনার্য সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে—

"The concept of the composite, goddess contained in its various elements such as her 'mother', 'daughter' and 'sister' aspects, her vedic Aryan element (e.f. her appellation Arya Kausiki, Katyayini etc. in the Aryan. Goddess of the Kusika and Katya clans) and last, but not the least, the various non-Aryan strands in her character."[২]

এইভাবে শিব-শক্তিবর্গীয় দেবতাদের অনার্য সংস্রব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আশুতোষ ভট্টাচার্য গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তেমনি আরো অনেকে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে

বিনয় ঘোষ অন্যতম। তিনি 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে ভগবান শিব এবং শক্তিবর্গীয় দেবী তারা, চণ্ডী, রঙ্কিনী, কালী, অম্বিকা, চর্চিকা, জাঙ্গুলী, কুলিশেশ্বরী, কোকামুখা, জগদ্ধাত্রী, বিন্ধ্যবাসিনী, পার্বতী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবী মাত্রকেই অনার্য বলে ধার্য করেছেন। তাঁর মতে—''আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল।''[৩]

পৌরাণিক যুগের ভৌগোলিক ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী বিভক্ত ছিল ন'টি অঞ্চলে বা 'বর্ষে'। ন'টি বর্ষের অন্যতম ছিল ইলাবৃতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ, এগুলি নিংসন্দেহে হল স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রতিরূপ। পামির উপত্যকা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল জুড়ে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগই সেকালে অভিহিত হয়েছিল ইলাবৃতবর্ষ রূপে। সেটি ছিল আর্যদের আদি নিবাসভূমি। আপাতদৃষ্টিতে ইলাবৃতবর্ষের ঐতিহ্য সম্ভাবনা থাকলেও এবং বৈদিক-পৌরাণিক জের টানলেও আর্য দেব-দেবীদের স্বরূপ কল্পনায় অনার্য উপাদানকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। আবার তথ্য সমর্থিতও নয়। ধ্বংসস্তূপের অন্তরাল থেকে কয়েক সহস্রাব্দ প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন উদ্ধার সম্ভব হলেও তার প্রকৃত তথ্য উদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি। বিশ্বের তথাকথিত লিপিবিশারদদের সমস্ত প্রয়াসকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মূর্তিমান সিন্ধুলিপি এবং তার সিলমোহরের বার্তা অদ্যাবধি অধরাই।[৪]

বাংলার সংস্কৃতিতে আর্য-অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ যে খুবই দীর্ঘ ও ব্যাপক তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চণ্ডী কেবলমাত্র অনার্য সংস্কৃতি প্রসূত নন, চণ্ডীর দেবী সত্তায় আর্য সংস্কৃতিরও মিশ্রণ আছে। কারণ—

১. মহাকবি কালিদাসের চারটি গ্রন্থে 'চাণ্ডী' শব্দের উল্লেখ আছে—মালবিকাগ্নিমিত্রম্ (৩/২১), বিক্রমোর্বশীয় (৪/২৮), রঘুবংশম্ (১২/৫) এবং মেঘদূতম্ (১০৫) -এ। মেঘদূতের অপর একটি শ্লোকের 'চণ্ডীশ্বর' শব্দের উল্লেখ আছে।

২. মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে 'মহামায়া' বলা হয়েছে এবং তিনিই শ্রীহরির যোগনিদ্রা রূপে বর্ণিত হয়েছেন। এই যোগনিদ্রাই প্রকট হন মহাকালীরূপে। মধুকৈটভের নিধনের পরে সকল দেবতার শক্তি সমন্বিত হয়ে মহিষাসুর নিধনকারী রূপে দেবী রূপ পরিগ্রহ করলেন। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত হলেন। এই চণ্ড-মুণ্ড বধ প্রসঙ্গে ক্রোধান্বিতা দেবীর ললাট থেকে যে করালী কালী মূর্তির

আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবতঃ সেই দেবী চণ্ডিকা নামে অভিহিত হয়েছে।

৩. মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত ৮১-৮৩ অধ্যায়ে দেবী মাহাত্ম্য বা দুর্গা সপ্তশতী নামে লিখিত অংশই পরে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রূপে প্রচলিত হয়েছে।

৪. চণ্ডিকা বা চণ্ডীর অর্থ প্রচণ্ডা দেবী। ঋগ্বেদে রুদ্রের ক্রোধকে কিছু পরিমাণে মূর্ত করে তাকে বলা হয়েছে 'মনা'।

এভাবে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে চণ্ডী সম্পর্কিত ধারণাগুলি প্রচলিত ছিল। উভয় সংস্কৃতির দেবী ভাবনা মিশ্রিত হয়ে চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীপূজার প্রচলন হয়ে থাকে। যেমন—নাটাই চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, শুভচণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, খাড়া শুভচণ্ডী, রখাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, রণ চণ্ডী, ওলাট চণ্ডী, বসন চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ককাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। চণ্ডীকে মঙ্গল বলার উদ্দেশ্য এই যে, 'চণ্ডী' ভীষণা প্রকৃতির দেবী, তাঁহার নিকট হইতে অমঙ্গলেরই আশঙ্কা বেশি—সেইজন্য তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁহার অপ্রিয় নামটি এড়াইবার প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাহার উল্লেখ করা হয়। ইহাকেই ইংরেজিতে euphemism বলে।[৫] তবে লৌকিক এই সমস্ত স্ত্রীদেবতা সমূহ চণ্ডী নামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁদের প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা থেকে যে তাদের উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের মধ্যে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে—এই আদিবাসী সমাজগুলিতে এখনো এইসব স্ত্রী দেবতাদের পূজা প্রচলিত আছে। পরবর্তীকালে সংস্কৃতের প্রভাববশত এই সকল অনার্য দেবতাদের নামের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে 'চাণ্ডী' শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত। এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি অস্ত্রাল জাতীয় ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামক এক শক্তি দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়— অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের কাছে তিনি প্রধান দেবতা। তিনি প্রসন্ন হলে পশু-শিকারে কৃতিত্ব ও যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়। ওরাওঁ যুবকেরা শিকারে বের হলে নিজেদের কাছে চাণ্ডীশিলা রাখে যাতে তারা পশু শিকারে সফল হয়। ওরাওঁ পল্লীগুলিতে, সাধারণত কোনও পর্বতের ঢালু জায়গায়, এক টুকরো পাথরের মধ্যে চাণ্ডীর অধিষ্ঠান। একটি চাণ্ডীশিলার

চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক শিলা থাকে। সেগুলিকে চণ্ডীর ছেলেপিলে বলা হয়। তবে 'চণ্ডী' সাধারণত অবিবাহিত যুবকদেরই দেবতা।

উল্লিখিত 'চাণ্ডী' ব্যতীত ওরাওঁদের সহরুল উৎসবের সময় আর এক দেবীর পূজা হয়ে থাকে। তাঁর নাম 'মূর্তি চাণ্ডী'। কোন বৃক্ষের নীচে অর্থ প্রোথিত প্রস্তর খণ্ডে 'মূর্তি চাণ্ডী' দেবীর অধিষ্ঠান করে থাকেন। এখন দেখা যেতে পারে যে ওরাওঁদের পূজিতা 'চাণ্ডী' ও 'মূর্তি চণ্ডীর' সঙ্গে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবীর কোন মিল আছে কিনা। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে যে দুটি কাহিনি আছে তার মধ্যে আখেটিক খণ্ডের নায়ক ব্যাধ যুবক। দেবী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজে তাঁর অধিষ্ঠান। অন্যদিকে ওরাওঁ সমাজের দেবতাও মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবতা। তাই বলা যেতে পারে ওরাওঁ সমাজের দেবী চাণ্ডী ও চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ কাহিনিতে বর্ণিত চণ্ডীদেবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আবার বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রে সকল স্ত্রীদেবতাকেই শক্তিরূপিনী বলে কল্পনা করা হত। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত 'বজ্রতারার' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেকেই মনে করেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা পরবর্তীকালে গ্রাম বাংলার লৌকিক দেবী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু 'সাধনমালা'য় 'বজ্রতারার' সাধনার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কোন যোগ নেই।

দাক্ষিণাত্যের মহীশূর ও কর্ণাটক অঞ্চলে 'বিসলমরী' বা বিসল 'মরীআম্মা' নামে এক অতি শক্তিশালিনী গ্রাম্য দেবী আছেন।[৬] বাংলাদেশে 'চণ্ডী' কথাটির মতো দাক্ষিণাত্যের বহু গ্রামে স্ত্রী দেবতার নামের পরেই 'মরী' অথবা 'মরীআম্মা' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই গ্রাম্য দেবতার প্রকৃত নাম 'বিসল', বাংলায় স্ত্রী-দেবতা বোঝাতে হয়েছে 'বিসলী', অতঃপর 'বিসুলী', 'বাসুলী'। ধ্বনিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে তারা বিসল 'মরী' নামে পরিচিত। উড়িষ্যাতেও এই দেবী 'বাসুলী' বলেই পরিচিত। উড়িষ্যার অস্ট্রিক্‌ভাষী জুয়াঙ্‌ উপজাতিদের মধ্যেও 'বাসুলী' নামক এক দেবীর পূজা হইয়া থাকে।[৭] ক্রমে চণ্ডী নামটি দাক্ষিণাত্যে 'মরী' বা 'মরীআম্মা' কথাটির মত বিশেষ কোনও দেবতার নাম না হয়ে তাই তা স্ত্রীদেবতাদের একটি পদবীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে মুণ্ডা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের শক্তি দেবতার পরিকল্পনা এই চণ্ডীর ভিতর দিয়ে সবশেষে পৌরাণিক পার্বতী, অন্নদা বা অন্নপূর্ণায় পরিণতি লাভ করেছে।

এইভাবে দূর অতীতে কৌম জনসাধারণের আরাধিত শক্তিদেবী 'চণ্ডী' নানা বর্গে

মিলিত হয়ে গৃহদেবী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। গৃহদেবী 'চণ্ডী' মূলত ব্রতকথায় 'চণ্ডী'। ব্রতকথার প্রধান অঙ্গ হল এর ছোট একটি নিটোল কাহিনি। এই কাহিনির মধ্যদিয়েই দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়ে থাকে। এই দেবী কখনো স্বামী-পুত্র-কন্যা প্রমুখের নিরোগ জীবনের কামনা পূরণের দেবী, আবার কখনো ধন প্রাপ্তির দেবী। এই দেবীর ব্রত বিভিন্ন প্রকার 'জয়মঙ্গলচণ্ডী', 'সোদোর চণ্ডী', 'নাটাই চণ্ডী' ইত্যাদি। কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তারা প্রত্যেকেই লৌকিক চণ্ডী রূপেই পূজিতা।

দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল', কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি বাংলা মধ্যযুগীয় কাব্যে 'চণ্ডীব্রত' অনুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলায় বিশিষ্ট কবিগণ চণ্ডীব্রতের যে আভাস ও ইঙ্গিত দিয়েছেন। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে সেই চিত্রগুলি আজও অম্লান। নারীসমাজে আদৃত হয়ে এই দেবী আদিম সমাজের পূজিতা দেবী 'চাণ্ডী' থেকে হয়ে উঠেছেন গৃহদেবী 'চণ্ডী'।

**চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারা :**

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল কাব্যধারা সর্বপ্রাচীন হলেও সর্বপ্রধান কাব্যধারা অবশ্যই চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারাটি দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি সমাজে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তার বিচারে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। মনসামঙ্গলের মতোই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানিকেও আমরা তিনটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি। যেমন—

১. উত্তরবঙ্গীয় ধারা

২. পূর্ববঙ্গীয় ধারা

৩. দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা।

উত্তরবঙ্গীয় ধারার প্রধান কবি হলেন মানিক দত্ত, পূর্ববঙ্গীয় ধারার প্রধান কবি হলেন দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য এবং দ্বিজ রামদেব এবং দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং রামানন্দ যতি প্রমুখ কবিগণ।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা গঠন পরিপুষ্ট কাব্য হল 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যেরও দুটি খণ্ড—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে রয়েছে—সৃষ্টিতত্ত্ব, হর-পার্বতীর সংসার, নীলাম্বরের অভিশাপের কাহিনি। নরখণ্ডের দুটি

কাহিনি—আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধখণ্ড অর্থাৎ কালকেতু ফুল্লরার উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ডে রয়েছে ধনপতি শ্রীমন্তের উপাখ্যান। দেবী চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ব্যাধ সম্প্রদায়ের দেবী। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের সমাজে তার পূজা প্রচলিত হয়। অনার্য নিম্নবর্গের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে চণ্ডীপূজার প্রচলন হয় অর্থাৎ দেবী নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন। চণ্ডী বণিক সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে (কারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন ক্ষমতাচ্যুত এবং বণিক সমাজ অর্থ কৌলীণ্যের জোরে সমাজের শিরোমণি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা এই কাহিনিরই বর্ণনা করে গেছেন তাঁদের কাব্যে। অতঃপর চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান প্রধান কবিদের পরিচয় এবং সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক বিভাজন অনুযায়ী উত্তরবঙ্গীয় ধারার প্রধান কবি হলেন মানিক দত্ত। যদিও তাঁর প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সংশয় রয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং মানিক দত্তকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার আদি কবি হিসেবে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

> ''জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালিদাস।
> কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস।।
> মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার।
> বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার।।''[৮]

মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের মতোই মানিক দত্ত আত্মপরিচয় দিয়ে কোনো পদ রচনা করেননি। তাঁর কাব্য পাঠে জানা যায় কবি একই সঙ্গে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। সহচরী পদ্মার পরামর্শে দেবী চণ্ডী ফুলফুল্যা নগরের মানিক দত্তকে গীত রচনায় নির্দেশ দিয়েছেন। কবি নিজে গায়েন ছিলেন। দল গঠন করে তিনি গান গাইতেন। ড. সুনীলকুমার ওঝা 'মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে'র ভূমিকা অংশে লিখেছেন—''তিনি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব্বের লোক হইতেই পারেন না বরং তাঁহার অন্তত্ ১৫০ শত বৎসরের পরের যে কোন সময়ে তাহার বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক।''[৯]

আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—সম্ভবত মানিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গলের ধারাটির প্রবর্তক। আবার সুকুমার সেন বলেছেন—মানিক দত্তের রচনার

কোন পুথিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মনসামঙ্গল কাব্যধারার সৃষ্টি, কিন্তু এই সময়ে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সমালোচকদের আলোচনায় ষোড়শ শতককেই মানিক দত্তের সময়কাল বলে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের সকল ভণিতায় নিজের সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে তার যে ব্যক্তিপরিচয় দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। সেই সঙ্গে কানা ও খোঁড়া অর্থাৎ প্রতিবন্ধীও ছিলেন। দেবী চণ্ডীর কৃপায় তাঁর বিকলাঙ্গতা দূর হয়—

> ‘‘মাণিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।
> কানা খোড়া দূর গেল দিব্ব্য হৈল গা।।’’[১০]

তিনি পেশায় ছিলেন গায়েন। কবি দোহার ও তম্বুর বা তানপুরা বাজনার সঙ্গে নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতেন। রঘু ও রাঘব নামক দুই দোহার বা পালিকে নিয়ে কলিঙ্গে চণ্ডীর গান গাইতে এসেছিলেন—

> ‘‘তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
> রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।
> তিন চারি জনে তার সম্প্রদা করিল।
> কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।’’[১১]

কলিঙ্গ নগরের রাজার কাছে কবি নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন। প্রফুল্লনগরে তাঁর বাসগৃহের কথা বলেছেন। আবার কোথাও দেবী চণ্ডীর কাছে তার সহচরি পদ্মা কবির ‘ফুলফুল্যানগর’ এ বাসস্থানের কথা প্রকাশ করেছেন। বিদগ্ধ সমালোচকেরা এই দুটি স্থান মালদহ শহরে অবস্থিত বলে অনুমান করেন। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ‘‘মানিক দত্তের রচনা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তিনি প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক। তাঁহার কাব্য এখনও মালদহ অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। তাহাতে যে সমস্ত স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা সমস্তই মালদহ বা গৌড়ের সন্নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত।’’[১২] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পালাভিত্তিক রচনা। মোট ষোল দিনে গীত পালাগান ষোলটি পালায় রচিত। পালাগুলি হল নিম্নরূপ—

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম পালা | : | মঙ্গলবার নিশা পালা—এই পালায় বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, দুর্গার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম। |
| দ্বিতীয় পালা | : | বুধবার দিবা পালা—দেবরাজের নিকট দুর্গার পঞ্চদাসী প্রাপ্তি, মর্ত্যে পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা সুরথকে পূজার নির্দেশ, মানিক দত্তকে গীত রচনার নির্দেশ। |
| তৃতীয় পালা | : | বুধবার নিশা পালা—দেবীর পশু সৃজন, নীলাম্বরের জন্ম ও বিবাহ। |
| চতুর্থ পালা | : | বৃহস্পতিবার দিবা পালা—নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি ব্যাধ হয়ে কালকেতুর জন্ম বিবাহ, পশুশিকার, পশুদের দেবীর নিকট প্রার্থনা। |
| পঞ্চম পালা | : | বৃহস্পতিবার নিশা পালা—দেবী কর্তৃক কালকেতুকে ছলনা, ধনদান এবং পরিশেষে পূজা প্রচারের নির্দেশ। |
| ষষ্ঠ পালা | : | শুক্রবার দিবা পালা—গুজরাট নগর পত্তন, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ, বন্দি ও পরে মুক্তি প্রার্থনা। |
| সপ্তম পালা | : | শুক্রবার নিশা পালা—দেবীর কৃপায় কালকেতুর মুক্তি প্রাপ্তি এবং পরে দেবীর কৃপায় কালকেতু-ফুল্লরার পুত্র লাভ ও স্বর্গে গমন। এখানে 'আখেটিক খণ্ড' সমাপ্ত এবং বণিক খণ্ডের সূত্রপাত। |
| অষ্টম পালা | : | শুক্রবার নিশা পালা—দেবীর চক্রান্তে ধনপতি, লহনা, ফুল্লরার মর্ত্যে মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ। ধনপতি লহনা এবং পরে ধনপতি-ফুল্লরার বিবাহ। |
| নবম পালা | : | শনিবার দিবা পালা—শুক-শারি প্রসঙ্গ, ধনপতির গৌড় যাত্রা ও অবস্থান লহনা কর্তৃক খুল্লনার লাঞ্ছনা এবং দেবীর সহায়তায় মুক্তিলাভ। |
| দশম পালা | : | শনিবার নিশা পালা—ধনপতি-খুল্লনার মিলন, শ্রীমন্তের জন্ম ও খুল্লনার পরীক্ষার আয়োজন। |
| একাদশ পালা | : | রবিবার দিবা পালা—খুল্লনার পরীক্ষা ও জ্ঞাতি ভোজন। |
| দ্বাদশ পালা | : | রবিবার নিশা পালা—ধনপতির দক্ষিণ পাটন গমন, পথের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন ও শেষে বন্দিদশা। |

ত্রয়োদশ পালা : সোমবার দিবা পালা—ধনপতির প্রতি দেবীর দয়া, খুল্লনার সাধভক্ষণ, শ্রীমন্তের জন্ম, শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটনে গমন।

চতুর্দশ পালা : সোমবার নিশা পালা—শ্রীমন্তের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন, রাজার নিকট কমলে কামিনীর বর্ণনা, বন্ধন ও দক্ষিণ মশানে শিরঃচ্ছেদের ব্যবস্থা, শ্রীমন্তের তর্পণ।

পঞ্চদশ পালা : মঙ্গলবার দিবা পালা—শ্রীমন্তের প্রার্থনা ও পরে রাজ সৈন্যের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ।

ষোড়শ পালা : মঙ্গলবার নিশা পালা—সিংহলরাজের পরাজয়, কমলেকামিনী দর্শন, শ্রীমন্তের বিবাহ, স্বদেশে প্রত্যাগমন, সকলের স্বর্গে গমন।

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যখানি সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে সূচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কাব্যধারায় এই গ্রন্থনরীতি নতুন। কাব্যের প্রথমে গায়েনী রীতিতে পদ্যের আদলে গদ্য ভঙ্গিমায় ধর্মের জন্ম কাহিনি বৃত্তান্ত লোক সম্মুখে বলেছেন। এ সম্পর্কে রজনীকান্ত চক্রবর্তী মতে—''মানিক দত্তের পদ্য, পদ্যের গন্ধযুক্ত গদ্য-রচনামাত্র।''[১৩] ব্রতকথার সাধারণ রীতির মধ্যদিয়ে কাহিনির সূচনা করে মূল স্রোতে ঘটনা প্রবেশ করেছে। এতে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি লঙিঘত হলেও সমকালীন মধ্যযুগীয় বাতাবরণে এরূপ ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা অসঙ্গত নয়। কাহিনি এখানে অতীত থেকে বর্তমানের অভিমুখে ফিরে এসেছে। কাহিনিতে পাঠকের সম্মুখে অলৌকিক গল্পের প্রতি মনসংযোগকারী কিছু ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় দেবমাহাত্ম্যমূলক আবহাওয়ায় তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ধর্মের হাই বা 'হাম্বি' থেকে আদ্যার জন্ম। আদ্যাকে দেখে ধর্মের সম্ভোগ বাসনা জাগ্রত হয় এবং ধর্ম আদ্যাকে সম্ভোগের জন্য অগ্রসর হয়। এই কাহিনিটি স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলোদ্দীপক ও অলৌকিক। কিন্তু নারীর আত্মসম্মান রক্ষার প্রসঙ্গটি কবি বাস্তবতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতি অনুযায়ী পশুগণের গোহারী অংশটি বর্ণিত হয়েছে। পশুগণের আর্তনাদ যন্ত্রণা প্রকট ও জীবন্ত করে তোলায় কবি এক নতুনতর রূপ চিত্রিত করেছেন। কবি গোহারী অংশে দুর্গার সঙ্গে কালীকে মিলিয়ে দিয়েছেন। মানিক দত্ত কাব্যের শেষে 'ব্রতকথা' নামক একটি অংশে উল্লেখ করেছেন—

''সোমবারে সর্ব্বলোক পূজিহ আপুনি।

মনের বাসনা পূর্ণ করিবে ভবানী।।
পূজার নিয়ম কথা শুন সর্ব্বজন।
করিহ দুর্গার পূজা হবে পুত্রধন।।
ব্রতকথা শুনি সভে করহ প্রণতি।
গাইল মানিক দত্ত মধুর ভারতী।।''[১৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, তাঁর কাব্যে ব্রতকথার নানান বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কাব্যটি মৌখিক সাহিত্যের ন্যায় অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। কাহিনি গ্রন্থনা অনেকাংশে লোকপ্রত্যয়, লোকগল্প, লোকবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিপদ চক্রবর্তী বলেছেন—''কাহিনী বিন্যাসে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে যে রূপকথা, লৌকিক কাহিনী, লোকায়ত প্রত্যয়ের মিশ্র প্রকাশ আছে তা অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলে বিরল। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য ধারায় প্রাচীন রূপটি ইহার মধ্যে অধিকতরভাবে বিদ্যমান।''[১৫] ফলে কবি কখন কখন দেবীর অলৌকিক মহিমা ও স্বরূপের প্রতি বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন। আবার অনেকসময় অতিরিক্ত চরিত্র বাহুল্যের কারণে সেই অতিরিক্ত চরিত্রগুলি নিয়ে ছোট ছোট উপকাহিনির সৃষ্টি হয়েছে। তবে কাব্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সম্পর্কিত রীতিনীতি আচারগুলি বাস্তব সম্মত বলে মনে হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অন্যতম আরেকজন কবি হলেন দ্বিজ মাধব। কবির প্রকৃত নাম আসলে মাধবাচার্য। দ্বিজ মাধবের কাব্য বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সন-তারিখ যুক্ত 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য'। কবির আত্মবিবরণী অংশে কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ''কবির বাসস্থান গঙ্গাতীরবর্তী সপ্তগ্রাম, পরবর্তীকালে কবি সম্ভবত সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কবির বাসস্থান পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কবির আত্মবিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নাম থাকলেও সে স্থানে কোথাও কিন্তু কবির পুথি খুঁজে পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মঙ্গলচণ্ডীর গীতের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কবির রচিত গান ঐ অঞ্চলেই অধিক প্রচারিত ছিল।''[১৬]

কবির আত্মপরিচয় অংশটি থেকে জানা যায় তাঁর পিতা পরাশর—

''পরাশর-সুত জান মাধব যে নাম।
কলিকালে হইল জগত অনুপাম।''[১৭]

কাব্য মধ্যে বারংবার তিনি এই ভণিতাই ব্যবহার করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য হওয়াতে অনেকেই কবির নাম মাধবাচার্য ব্যবহার করার পক্ষপাতি নন। তবে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা নিজেকে 'পরাশর' পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবাচার্য এবং 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্ক রয়েছে। দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যের আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন—

''ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত।। (দ্বিজ মাধব/২৯৬)

সম্ভবত ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে কবি কাব্যরচনা করেছেন। কবি মোঘল সম্রাট আকবরের সুশাসনের কথা কাব্য মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ ছিলেন আকবর। তিনি ১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিদ্রোহী সুলতান দাউদ খাঁকে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করেন সুতরাং বলা যায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে দ্বিজ মাধব কাব্য রচনা করেন।[১৮] অনেকেই কবি প্রদত্ত শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। সুকুমার সেনের মতে—দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৬৪৪-১৬৪৫-১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ।[১৯] এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিলে আকবর বাদশাহের সময়কালকে অস্বীকার করতে হয়।

কবি দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের নাম— 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। কবি নিজের কাব্যকে নানা নামে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি নিজের কাব্যকে কোথাও সারদামঙ্গল বা 'সারদাচরিত' ও বলেছেন। সমকালে গীত বলতে পাঁচালীকেই বোঝানো হয়েছে। এটি একটি পালাভিত্তিক রচনা। সমগ্র কাব্যটি ষোলটি (১৬টি) পালায় রচিত। প্রত্যেকটি পালার পৃথক নামকরণ রয়েছে এবং প্রতিটি পালা খণ্ড খণ্ড গীত আকারে রচিত। প্রত্যেকটি গীতেই রাগ-রাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। কাব্যখানিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

প্রথম পালা : বন্দনা; গণেশসহ অন্যান্য পঞ্চদেবতার বন্দনা, কবির আত্মপরিচয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পালা : মঙ্গল-চণ্ডী; এই পালায় আছে মঙ্গল দৈত্যের তপস্যা, বর লাভ স্বর্গরাজ্য অধিকার, দেবীর মঙ্গলদৈত্য বধ ও মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ।

তৃতীয় পালা : মর্ত্য-লীলার সূচনা; এখানে দ্বিতীয়বার বন্দনা, ইন্দ্রের ব্যাধি-খণ্ডন,

ইন্দ্র কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী পূজা ও দেবী পঞ্চকন্যা লাভ, কলিঙ্গরাজকে পূজা করতে নির্দেশ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা।

চতুর্থ পালা : কালকেতু; এই পালায় আছে নীলাম্বরের অভিশাপ, কালকেতুর জন্ম ও বিবাহ।

পঞ্চম পালা : সুবর্ণ গোধিকা; ধর্মকেতুর মৃত্যু থেকে গুজরাট রাজ্য স্থাপন।

ষষ্ঠ পালা : ভাঁড়ুদত্ত; এই পালায় আছে গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন, কালকেতুর যুদ্ধযাত্রা, কালকেতুর কারাবাস ইত্যাদি।

সপ্তম পালা : শাপমুক্তি; কালকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব, কারামুক্তি, ভাঁড়ুদত্তের শাস্তি এবং কালকেতুর স্বর্গযাত্রা পর্যন্ত এই পালার বর্ণনা।

অষ্টম পালা : উজানী ও ইছানী; এই পালায় আছে শিবের মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে ধনপতির বিবাহ বার্তা পর্যন্ত।

নবম পালা : লহনার কুমতি; এই পালায় আছে ধনপতির বিবাহের কথা, শুনে লহনার বিলাপ থেকে শুরু করে ধনপতির গৌড়যাত্রা, খুল্লনার ছাগল চরানোর প্রস্তাব।

দশম পালা : খুল্লনার দেবী পূজা; এখানে আছে খুল্লনার ছাগল চরানো থেকে শুরু করে খুল্লনার দেবী পূজা, ধনপতির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

একাদশ পালা : মিলন; স্বামীর সহিত খুল্লনার মিলনের জন্য গমন থেকে শুরু করে মিলন পর্যন্ত।

দ্বাদশ পালা : অগ্নিপরীক্ষা; খুল্লনা সন্তান সম্ভাবনা থেকে শুরু করে জ্ঞাতিগণের গুয়াপান গ্রহণে অসম্মতি, খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান এবং মালাধরের অভিশাপ।

ত্রয়োদশ পালা : কমলেকামিনী; ধনপতির সিংহল যাত্রা থেকে আরম্ভ করে শ্রীমন্তের জন্ম পর্যন্ত।

চতুর্দশ পালা : শ্রীমন্তের বাল্যলীলা; শ্রীমন্তের বাল্য কথা বর্ণনা থেকে শুরু করে পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের দুর্ব্যবহার এবং শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত।

পঞ্চদশ পালা : শ্রীমন্তের মশান; শ্রীমন্তের যাত্রাপথ বর্ণনা, কমলে-কামিনী দর্শন, সিংহলরাজের কাছে কমলে-কামিনী বর্ণনা, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া, দেবীর সহিত সিংহল রাজের যুদ্ধ, পিতা-পুত্র পরিচয়, সুশীলা শ্রীমন্তের বিবাহ এবং স্বপ্ন দর্শন পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত হয়েছে।

ষোড়শ পালা : প্রত্যাবর্তন, এই পালায় আছে ধনপতি-শ্রীমন্তের স্বদেশ যাত্রা থেকে শুরু করে স্বর্গ গমনের কাহিনি।

মাধবাচার্য বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবাচার্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব পর্যন্ত যে মাধবানন্দ নামেই পরিচিত ছিলেন তা যশোদল ভট্টাচার্য মাধবাচার্যের শাক্ত ভ্রাতা শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের বংশধর কালীহর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মুদ্রিত 'ঈশান মিশ্র বংশম্' নামক গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করার পূর্বেই দ্বিজমাধব তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে—

''তেষান্তু প্রথমো নাম মাধবানন্দ বৈষ্ণবঃ।
গৃহীত্বা বৈষ্ণবীং দীক্ষাং বিষ্ণুভক্তিপারঈমঃ।।
মাধবানন্দ সন্তানা গোস্বামী খ্যাতিমাগতাঃ।
চান্দুড়া নামক গ্রামে তেষাং কেচিজ্জগামহ।।''

কেউ কেউ মনে করেন, দ্বিজ মাধব আচার্য উপাধিধারী গ্রহবিপ্র ছিলেন, কারণ, সূর্য-বন্দনা দিয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—''এ কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কবির স্বহস্তলিখিত কিংবা সমসাময়িক কালে প্রচলিত পুঁথি যখন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কি করিয়া বলা যায়? তাঁহার প্রাচীনতম পুঁথিও তাঁহার সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর ব্যবধানে হইয়াছে, তাহাতে ইহার কোনও অংশ কবির মৌলিক রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তবে সূর্যের বন্দনা দিয়া তাঁহার কোনও কোনও পুঁথি (সকল পুঁথি নহে) আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা সত্য।''[২০]

এই বন্দনাংশ থেকে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কারণ এই প্রকার বন্দনা রচনা পুথির গায়েনদের ব্যক্তিগত ধর্মবোধ দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হত। তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তারা নতুন দেবতার বন্দনা সংযোগ করতেন।

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যকে কোন কোন স্থানে 'সারদাচরিত' বলে উল্লেখ করলেও

কোথাও আবার 'সারদা-মঙ্গল'ও বলেছেন—

''সারদা-মঙ্গল দ্বিজ মাধবে রস গায়।''[২১]

অথবা, ''দ্বিজ মাধবে গায় সারদা-মঙ্গল।''[২২]

পূর্বেই বলেছি কবির কাব্যের নামকরণ নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—''দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের নাম 'সারদা-চরিত' অথবা 'সারদা-মঙ্গল' ইহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব ইহার দ্বিতীয় মুদ্রিত সংস্করণের সম্পাদক যে ইহার 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই নামকরণ করিয়াছেন। তাহা সমীচীন হয় নাই। দ্বিজ মাধবের অধিকাংশ ভণিতাই প্রায় এই প্রকার—

''সারদার চরণ-সরোজ-মধুর-লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হৈয়া শোভে।''[২৩]

দ্বিজ মাধব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঠিক প্রথম শ্রেণির কবি না হলেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টিতে এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁকে অন্যান্য কবিদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তুলেছে। কালকেতুর কাহিনিতে ব্যাধ নায়ক ও তার পত্নীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ সাধনের জন্য যে শুধুমাত্র কবিত্বগুণের দ্বারাই বিকশিত হবে তা নয়, অনার্যজীবনের প্রতি এক সহানুভূতিরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিজ মাধবের যে অভিজ্ঞতা ছিল সে কথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর মানব চরিত্র বিশ্লেষণে এক নিপুণ ক্ষমতা ছিল এবং তার দ্বারাই তিনি সমাজ-বহির্ভূত অনার্য জীবনের চিত্রটিকে বাস্তব ও সজীব করে তুলেছিলেন। বর্ণনার স্বাভাবিকত্বই দ্বিজ মাধবের বিষয়বস্তুকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। কালকেতুর কাহিনির মতো ধনপতি সদাগরের কাহিনিও তাঁর সমাজের ব্যক্তি চরিত্রের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। লহনা-খুল্লনার বিবাদ সমকালের বহুবিবাহ-পীড়িত বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের কলঙ্ক রূপে চিরকাল পরিচিত হয়ে থাকবে। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অতিক্রান্ত যৌবনা পত্নী যুবতী সতিনীর উপর নির্যাতনের চিত্রটি বাস্তব-সম্মত বলেই মনে হয়—

''খুলনায় বলে দিদি গায়ে মোর জ্বর।
হস্ত দিয়া চাহ মোর ললাট উপর।।

অবসাদ মাত্র দেয় আজি না যাইমু।
কালিকা প্রভাতে দিদি ছেলী লইয়া যাইমু।।
লহনায় বলে বিটি লজ্জা নাই তোর গায়।
আপনা গৌরব রাখি ছেলী লইরা যায়।।
লহনার বাক্য রামা সহিতে না পারে।
ছাগল লইয়া চলে কানন ভিতরে।।''[২৪]

দ্বিজ মাধবের অন্যতম প্রধান গুণ তিনি বাঙালি জীবনের বাস্তব পটভূমিকার উপর এক পূর্ণাঙ্গ গার্হস্থ্য চিত্র পাঠককে উপহার দিয়েছেন। বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বস্তুনিষ্ঠ ও সহজ সাবলীলত্বের যে ভাব সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে তা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের কবি মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য এই যে, মুকুন্দের কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি প্রবণতা কিংবা মানব-চরিত্র সৃষ্টির কৌশলই তাঁকে এই বিষয়ে সার্থকতা দান করেছে। ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি অন্যান্য চরিত্রের মতো সংক্ষিপ্ত নয়। সেজন্য কবির বাস্তব জীবনদর্শন সর্বাপেক্ষা সার্থক হয়েছে।

''দ্বিজ মাধবের কবি মুকুন্দকে আদর্শ করেননি, তিনি আদর্শ করেছিলেন মানিক দত্তকে। যে অঞ্চলে মুকুন্দের কাব্য প্রচলিত ছিল, সে অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের কাব্য অপ্রচলিত ছিল। দ্বিজ মাধবের কাব্য প্রধানত চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবিদের কাছে আদর্শ ছিল। আর কবি কঙ্কণের কাব্য রাঢ়ের কবিদের কাছে আদর্শ ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অবলম্বন করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি রচনা করায় তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ ধুয়ার মত কতকগুলি গীত রচনাও স্থান পেয়েছে। দ্বিজ মাধব এগুলিকে 'বিষ্ণুপাদ' বলে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত কবিই এই রীতির প্রবর্তক এবং এর দ্বারাই সেযুগে মঙ্গলকাব্যের উপর বৈষ্ণব প্রভাব প্রমাণিত হয়। আবার আখ্যানমূলক কাব্যরচনার অন্তরালেও মঙ্গলকাব্যের কবিদের যে গীতি প্রাণতার ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, তাও অনুভব করা যায়। দ্বিজ মাধবের পুথিতে—দ্বিজ মাধব, দ্বিজ মাধবানন্দ, দ্বিজ রামদেব ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপদও পাওয়া যায়। তাঁর পুঁথিতে ব্যবহৃত বিষ্ণুগুলি মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিজ মাধবের এই বিষ্ণুপদ ব্যবহারের রীতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরবর্তী কবিরা অনুসরণ করেছিলেন।''[২৫] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের

পূর্ববঙ্গীয় ধারায় আরেকজন কবি হলেন—দ্বিজ রামদেব। ''দ্বিজ রামদেব বাংলা সাহিত্যে খুব একটি চর্চিত নাম নন। ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে তাঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি ছিলেন সম্ভবত চট্টগ্রামের মানুষ, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তাঁর কাব্য রচিত। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ, কবি নিজের বাসস্থান কিংবা মায়ের নাম উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র পিতৃনামের উল্লেখ করেছেন। কবির পিতার নাম কবিচন্দ্র। কাব্যের উপসংহারে তিনি এক কালজ্ঞাপক শ্লোকের উল্লেখ করেছেন—

''ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।
রচিলেন রামদেবে সারদা চরিত।।'' (দ্বিজ রামদেব/৪০৯)

এই গ্রন্থের সম্পাদক আশুতোষ দাসের গণনা অনুসারে ইন্দু -১, বাণ - ৫, ঋষি - ৭, বাণ - ৫, অর্থাৎ ১৫৭৫ শকাব্দ 'বেদ সনজিত' এর অর্থ এখানে চার অঙ্ক বেশি হয়েছে অর্থাৎ (১৫৭৫-৪ = ১৫৭১) শকাব্দে কবি কাব্য রচনা করেন।''[২৬]

আশুতোষ ভট্টাচার্য '' 'বেদ সনজিত' কথাটিকে 'শক নিয়োজিত' ধরেছেন এবং ডানদিক থেকে গণনা করে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন বলে অনেকেই মনে করেন। তিনি মগদের ও ফিরিঙ্গিদের কথা বলেছেন। ফিরিঙ্গি এবং মগরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করেন। সুতরাং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে দ্বিজ রামদেব তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।''[২৭]

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি কোন পালাভিত্তিক রচনা নয়, চারটি উপাখ্যান সংযোগে আখ্যানটি তৈরি। উপাখ্যানটি হল—

১. মঙ্গলদৈত্য বধ।

২. চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারাভিযান ও কালকেতু উপাখ্যান।

৩. ধনপতি উপাখ্যান।

৪. শ্রীপতি উপাখ্যান।

প্রতিটি উপাখ্যানই ছোট ছোট পদ বা খণ্ড খণ্ড কবিতার সমষ্টি এবং প্রতিটি কবিতার উপর রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। দ্বিজ মাধবের মতো দ্বিজ রামদেবও তাঁর কাব্যকে কোনও কোনও স্থানে 'সারদা-চরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ রামদেবের পুথিটি সূর্য বন্দনা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। দ্বিজ রামদেব অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুকরণ

করেছিলেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় কাহিনি নির্মাণ পরিকল্পনাটি হুবহু এক। আবার মুকুন্দের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিজ রামদেব যে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা মনে হয় না। কারণ মুকুন্দের কাব্যের কোন প্রভাব তার কাব্যে পড়েনি। কালকেতুর কাহিনি কিংবা ধনপতির উপাখ্যানে কোথাও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। কাহিনির পুরোটাই তিনি দ্বিজ মাধবকে অনুসরণ করে রচনা করেছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দক্ষিণবঙ্গীয় বা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী। মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে তিনিই অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের যে গুটিকয়েক কাব্য কালোত্তীর্ণ ও যুগোত্তীর্ণ হয়ে ধর্মকে অতিক্রম করে সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসে আজও আধুনিক যুগের মানুষের আস্বাদ্য তার মধ্যে মুকুন্দ রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য নিঃসন্দেহে অন্যতম। মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দুটি পর্যায়ে তাঁর আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ। প্রথমটি মুকুন্দের গ্রাম দামুন্যা বা দামিন্যায় রক্ষিত পুথিতে এবং দ্বিতীয়টি বর্ধমান সাহিত্য সভার ৩২ নং পুথিতে লিপিবদ্ধ। প্রথম আত্মকাহিনিতে মুকুন্দের নিজভূমি দামিন্যার বিবরণ ও তাঁর বংশ পরিচয় আছে, যার সঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনির গভীর মিল আছে। দ্বিতীয় আত্মকাহিনিতে কবির দেশত্যাগের মর্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত এবং কাব্য রচনার ইতিহাস। প্রথম আত্মকাহিনিতে যে বংশলতিকা আছে তা থেকে জানা যায় কবি রাঢ়ী শ্রেণির কয়ড়ি কুলে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পিতা ছিলেন গুণরাজ মিশ্র (প্রকৃত নাম হৃদয় মিশ্র), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র এবং দুই পুত্র শিবরাম ও পঞ্চানন, জামাতা মহেশ, দুই কন্যা যশোদা ও চিত্রলেখা। কবির আত্মকাহিনিতে জানা যায় যে সেলিমাবাদ শহর নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর প্রজারূপে তাঁদের কয়েক পুরুষ দামিন্যা বা দামুন্যায় বাস করত। কিন্তু ডিহিদার মামুদ (মহম্মদ) সরিপ ও তাঁর সহযোগীদের উৎপীড়নের ফলে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন। তখন তাঁর হিতৈষী শ্রীমন্ত খাঁ ও গ্রামের মণ্ডলের সঙ্গে পরামর্শ করে সপরিবারে সুহৃদ রামানন্দ বা রামানন্দীর সঙ্গে অজানা আশ্রয়ের আশায় পৈত্রিক নিবাস ত্যাগ করেন।

যাত্রাপথে কবি দস্যুর কবলে পড়ে সব হারান। তারপর অনেকগুলো গ্রাম ও নদী পেরিয়ে গোচাড়িয়া (গোথড়া বা গোচড়্যা) গ্রামে পৌঁছে রাজভয়ে ভীত এবং ক্ষুধা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন হলেন। নিদ্রাকালে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে 'সঙ্গত' অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল রচনার নির্দেশ দেন। স্বপ্নের কথা রামানন্দীকে বলে আবার তাঁদের পথ চলা শুরু

হয়। তার পরে শিলাই নদী পেরিয়ে ব্রাহ্মণভূমি রাজ্যের রাজধানী 'আড়রা'তে পৌঁছে রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেয়ে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রঘুনাথ রায় রাজা হলে তাঁর অনুরোধে কবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

''মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত (১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর কবিত্ব শক্তির জন্য রাজা রঘুনাথ রায় সম্ভবত তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির জন্মকাল ও কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে এক মতদ্বৈধতা আছে। এ ব্যাপারে তাঁরা রচনাকাল জ্ঞাপক হেঁয়ালীপূর্ণ শ্লোকের ওপর নির্ভর করেছেন—

শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।

অর্থাৎ ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য রচনাকাল (প্রথমে মুদ্রিত গ্রন্থ ১৮২৩-২৪ খ্রিঃ রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত)''[২৮]

দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কবির জন্ম ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ বা গ্রন্থ রচনার কাল ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ। আবার মঙ্গলকাব্যের বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য কাব্যটি ১৫৯৪-১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত বলে মনে করেন। সুকুমার সেনের মতে মুকুন্দের কাব্য রচনা শুরু ১৬০৩/৪ এবং শেষ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে। এই মতবিরোধের অন্যতম কারণ হল সাংকেতিক শব্দের প্রয়োগ। মানসিংহের স্তুতি ও সমকালে ডিহিদারের প্রজাপীড়ন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে মানসিংহের মুঘল সুবেদার হিসেবে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের অধীপ হওয়ার কাল ৪ঠা মে ১৫৯৪ এবং তার ঐ পদ থেকে বিদায় ১লা সেপ্টেম্বর ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে পাঠান সামন্ত ওসমানের এই অঞ্চল পুনরাধিকারের ফলে এবং মানসিংহের রাজত্বকালে ডিহিদারের খেয়ালিপনা ও অত্যাচার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চারটি অংশ—

১. বন্দনা
২. দেবখণ্ড
৩. আখেটিক খণ্ড বা কালকেতুর উপাখ্যান
৪. বণিক খণ্ড বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

বন্দনাংশে— গণেশ বন্দনা, লক্ষ্মী বন্দনা ইত্যাদি।

দেবখণ্ডে— সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা, সতীর কথা, উমার সংসার, উমার সংসার ত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় কন্যা গৌরীরূপে তাঁর জন্ম, হর- গৌরীর বিবাহ, গার্হস্থ্যরূপ, দারিদ্র্য, দাম্পত্য কলহ, চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের বাসনা এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ।

আখেটিক খণ্ডে— কালকেতুর উপাখ্যান কালকেতুর বিবাহ; কালকেতুর সংসার, অরণ্যে পশুর দূরবস্থা, কালকেতুকে দেবীর ছলনা, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, গুজরাট স্থাপনের উদ্যোগ, নগরস্থাপন, ভাঁড়ুদত্ত, গুজরাট আক্রমণ, কালকেতুর পরাজয় ও বন্ধন, পরিত্রাণ, নীলাম্বরের শাপমোচন।

বণিক খণ্ড— রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি, খুল্লনার জন্ম, পায়রা-বাজি, খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব, বিবাহ, শুক-সারির কথা, ধনপতির গৌড় যাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল চড়ানো, দেবীর অনুগ্রহ, ধনপতি প্রত্যাবর্তন সংসার সুখ, খুল্লনার উৎসব, মালাধরের শাপপ্রাপ্তি, স্বজাতির ঘোঁট, খুল্লনার পরীক্ষা, ধনপতির সিংহলযাত্রার প্রস্তাব, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পথের অভিজ্ঞতা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, ধনপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির জন্ম, শ্রীপতির বাল্যকাল, সিংহল যাত্রার উদ্যোগ, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, সপ্তগ্রাম অবধি পথ, সেতুভঙ্গের ঘটনা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, সিংহলে শ্রীপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ, সিংহলের রাজার নতিস্বীকার, ধনপতির উদ্ধার, পিতাপুত্রের মিলন, রাজকন্যার সহিত বিবাহ, দেশে প্রত্যাবর্তন, রাজসভায় সঙ্কট, দেবীর আনুকূল্য ও শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম পত্নীর দুঃখ, অষ্টমঙ্গলা, খুল্লনার ও সস্ত্রীক শ্রীপতির শাপমোচন, দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঘটনা চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দ স্বভাবের অনুবর্তী হয়ে নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সহ বাস্তব চিত্র অঙ্কণ করেছেন। তা দেব কাহিনিতে হর- গৌরীর প্রসঙ্গেই হোক বা কালকেতুর উপাখ্যানেই হোক। এখানে দেবতারাও পারিবারিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। কালকেতু ও ফুল্লরা মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠেনি। কারণ তাদের মধ্যে দিয়ে ঐ যুগের সন্দেহ, অবিশ্বাস, কপটতা ও সামাজিক সংঘাত এসে চরিত্রগুলোকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। ফুল্লরার শঙ্কা, ঈর্ষা, ক্রোধ ও কারুণ্যের চিত্র যথার্থই অনন্য। ব্যাধখণ্ডে ফুল্লরা যেন দেবীরই প্রতিনায়িকা। আবার টাইপ (type) চরিত্র সৃষ্টিতে মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্ত মুকুন্দের অনন্য সৃষ্টি। মঙ্গ

লকাব্যের অলৌকিকতা ও বাস্তবতাকে কবি পরিপূর্ণ রূপে ত্যাগ করতে পারেননি—তা সত্য। তবে কবির মুখ্য লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজ চিত্রণ— সেখানে তিনি সিদ্ধ-শিল্পী।

দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারার আরেকজন চণ্ডীমঙ্গলের কবি হলেন রামানন্দ যতি। মুকুন্দের কাব্যের গ্রাম্যতা এবং ভারতচন্দ্রের স্থূল নাগরিকতা থেকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন। তিনি ছিলেন একজন বৈষ্ণব সমাজের রামানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গলের দু'খানি মাত্র পুথি পাওয়া গেছে। একখানি মূল পুথি, লেখক কর্তৃক স্বহস্তে পরবর্তীকালে সংশোধিত এবং আরেকটি তার ভক্তশিষ্য কর্তৃক নিজস্ব রচনার সংযোজন সহ পুনর্লিখিত। কাব্য মধ্যে রামানন্দের ব্যক্তিপরিচয়ের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু কাব্যের রচনাকাল বিষয়ে তিনি এক স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন—

''গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।''[২৯]

গজ - ৮, বসু - ৮, ঋতু - ৬, চন্দ্র - ১ = ৮৮৬১ অঙ্কস্যবামা গতি। এটি উল্টে দিলে হবে ১৬৮৮ শকাব্দ। অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাপ্ত 'ক' পুথিটিতে এর পরেও একটি সুদীর্ঘ মাতৃস্তব রয়েছে।

কবি তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে (১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে) অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার ১৪ বছর পরে। মুকুন্দের কাব্যের সমালোচনা করার মূল উদ্দেশ্যেই রামানন্দ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করেছিলেন—

''মুকুন্দের বিরচন ইন্দ্রপুরে কান্টাবন
ইন্দ্র সুত তাহে তোলে ফুল।
সর্পভূষা শোভে আঁকে পুষ্পের কন্টকে তাঁকে
দংশিয়া করিল বেয়াকুল।।''[৩০]

অথবা,

''কালী দহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালী
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবর।।''[৩১]

দেবখণ্ডে— সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা, সতীর কথা, উমার সংসার, উমার সংসার ত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় কন্যা গৌরীরূপে তাঁর জন্ম, হর- গৌরীর বিবাহ, গার্হস্থ্যরূপ, দারিদ্র্য, দাম্পত্য কলহ, চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারের বাসনা এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য প্রেরণ।

আখেটিক খণ্ডে— কালকেতুর উপাখ্যান কালকেতুর বিবাহ; কালকেতুর সংসার, অরণ্যে পশুর দূরবস্থা, কালকেতুকে দেবীর ছলনা, কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, গুজরাট স্থাপনের উদ্যোগ, নগরস্থাপন, ভাঁড়ুদত্ত, গুজরাট আক্রমণ, কালকেতুর পরাজয় ও বন্ধন, পরিত্রাণ, নীলাম্বরের শাপমোচন।

বণিক খণ্ড— রত্নমালার শাপপ্রাপ্তি, খুল্লনার জন্ম, পায়রা-বাজি, খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব, বিবাহ, শুক-সারির কথা, ধনপতির গৌড় যাত্রা, খুল্লনার নির্যাতন, ছাগল চড়ানো, দেবীর অনুগ্রহ, ধনপতি প্রত্যাবর্তন সংসার সুখ, খুল্লনার উৎসব, মালাধরের শাপপ্রাপ্তি, স্বজাতির ঘোঁট, খুল্লনার পরীক্ষা, ধনপতির সিংহলযাত্রার প্রস্তাব, ধনপতির সিংহলযাত্রা, পথের অভিজ্ঞতা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, ধনপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির জন্ম, শ্রীপতির বাল্যকাল, সিংহল যাত্রার উদ্যোগ, শ্রীপতির সিংহল যাত্রা, সপ্তগ্রাম অবধি পথ, সেতুভঙ্গের ঘটনা, কমলে-কামিনী দৃশ্য, সিংহলে শ্রীপতির নিগ্রহ, শ্রীপতির পরিত্রাণে দেবীর উদ্যোগ, সিংহলের রাজার নতিস্বীকার, ধনপতির উদ্ধার, পিতাপুত্রের মিলন, রাজকন্যার সহিত বিবাহ, দেশে প্রত্যাবর্তন, রাজসভায় সঙ্কট, দেবীর আনুকূল্য ও শ্রীপতির দ্বিতীয় বিবাহ, প্রথম পত্নীর দুঃখ, অষ্টমঙ্গলা, খুল্লনার ও সস্ত্রীক শ্রীপতির শাপমোচন, দেবীর কৈলাসে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঘটনা চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দ স্বভাবের অনুবর্তী হয়ে নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সহ বাস্তব চিত্র অঙ্কণ করেছেন। তা দেব কাহিনিতে হর- গৌরীর প্রসঙ্গেই হোক বা কালকেতুর উপাখ্যানেই হোক। এখানে দেবতারাও পারিবারিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। কালকেতু ও ফুল্লরা মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক নায়ক-নায়িকা হয়ে উঠেনি। কারণ তাদের মধ্যে দিয়ে ঐ যুগের সন্দেহ, অবিশ্বাস, কপটতা ও সামাজিক সংঘাত এসে চরিত্রগুলোকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। ফুল্লরার শঙ্কা, ঈর্ষা, ক্রোধ ও কারুণ্যের চিত্র যথার্থই অনন্য। ব্যাধখণ্ডে ফুল্লরা যেন দেবীরই প্রতিনায়িকা। আবার টাইপ (type) চরিত্র সৃষ্টিতে মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্ত মুকুন্দের অনন্য সৃষ্টি। মঙ্গ

কামরূপে কিছুকাল করিলেন বাস।
আজ্ঞা পায়্যা উড়িষ্যাতে করেন সন্ন্যাস।।
গৌড় দেশে আগমন জ্ঞান দান দিতে।
এমন দয়ালু কেবা দেখ্যাছে কলিতে।।
দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত কহে সকলের হিত।
বিপরীত না ভাবিও করো শুদ্ধ চিত।।''[৩৯]

সমকালীন সমাজের চিত্রপট নির্মাণে রামানন্দ অনেকটাই শিথিল। রামানন্দের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত একেবারেই আলাদা। কলিঙ্গ রাজের কাছে কালকেতুর নতুন রাজা হওয়ার খবর নিয়ে সে তিনশো সৈনিক চেয়ে নিয়েছে। তারপর এই সৈনিকদেরই ছদ্মবেশে পাঠিয়েছেন কালকেতুর দরবারে। প্রথম একশোজন এসেছে অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে, এরপর পঞ্চাশজন এসেছে ঘোড়ার ব্যবসায়ী হয়ে। পরের পঞ্চাশজন হলো অস্ত্র বিক্রেতা। বাকি একশো জনের কেউ সেজেছে ভিক্ষুক কেউবা গৃহবিপ্র। ভাঁড়ু নিজে কালকেতুর কাছে এসে বলে—কলিঙ্গরাজ তাকে পাঠিয়েছে কালকেতুকে পরম সমাদরে রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কালকেতু প্রথমে রাজী হয়নি। কিন্তু ভাঁড়ুর দলের ছদ্মবেশী সৈন্যরা তাকে যেতে বলে—

''ভাড়ু দত্ত কয় শুন মহাশয়
আমরা লোক রাজার।''[৪০]

শেষে ফুল্লরা অনুরোধ করায় ভাঁড়ুর পাঠানো ছদ্মবেশী সৈনিকেরা কালকেতুর সঙ্গে যাত্রা করলো। পথে এই সৈন্যরাই কালকেতুকে বন্দী করলো। রামানন্দ ভাঁড়ু দত্তকে এক ষড়যন্ত্রকারী চরিত্ররূপে নির্মাণ করেছেন।

কালকেতু বা ফুল্লরা চরিত্রেও বাস্তবিকতার অভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে পার্থিব জীবনরস অনুভব করা যায় না। মুকুন্দের জীবনরস বর্ণনাকে রামানন্দ 'কুরস' বলে অভিহিত করেছেন। আধ্যাত্মানুভূতির গভীরতা, ভক্তিরসের প্রাবল্য ইত্যাদির কারণে রামানন্দ চিরকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ভক্তকবি রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**তথ্যসূত্র :**


১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৬।

২. Bajerjea, J.N. : Ibid, p. 491.

৩. ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃ. ৪২।

৪. রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, এপ্রিল, ২০১৪, (দেবীচণ্ডী : অনার্য উৎস - বিনয়কুমার মাহাতা), পৃ. ৪১।

৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৬।

৬. Whitehead, H. : The villages of south India (Calcutta, 1921), 29 80, 81, 83.

৭. Risley, H. H. : Tribes and Caste of Bengal, Vol. I (Calcutta, 1891), p. 359.

৮. মণ্ডল, সন্দীপকুমার : (ভাষা-পাঠান্তর-টীকা), শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৪৩।

৯. ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পাদিত) : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, ভূমিকা অংশ।

১০. তদেব, : পৃ. ৩৪।

১১. তদেব, : পৃ. ৩৫।

১২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪।

১৩. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত : মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, সম্পাদক - নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

১৪. ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পাদিত) : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৬।

১৫. চক্রবর্তী, হরিপদ : কবি মানিক দত্ত প্রসঙ্গে : সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, ভূমিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, প্রবন্ধ অংশ।

১৬. ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) : মঙ্গলচণ্ডীর গীতা, দ্বিজ মাধব, কবি-প্রসঙ্গ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা অংশ।

১৭. তদেব, : পৃ. ৭।

১৮. তদেব, : পৃ. ভূমিকা অংশ, কবি প্রসঙ্গ।

১৯. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৩৯৩।

২১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুথি, ৭০ (ক)।

২২. তদেব, : পৃ. ১০৬ (ক)।

২৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।

২৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৭। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথি ৫১ খ - ৫২ খ)

২৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৮।

২৬. দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত) : অভয়ামঙ্গল-দ্বিজ রামদেব (ভূমিকা অংশ, কবি পরিচয়)।

২৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৫৪৩।

২৮. তদেব, : পৃ. ৩৮।

২৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ৪০১।

৩০. তদেব, : পৃ. ২০০।

৩১. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩২. তদেব, : পৃ. ১০২।

৩৩. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩৪. তদেব, : পৃ. ২৪৬।

৩৫. তদেব, : পৃ. ২১৫।

৩৬. তদেব, : পৃ. ২৫৫।

৩৭. তদেব, : পৃ. ৪০৯।

৩৮. তদেব, : পৃ. ৪১০।

৩৯. তদেব, : পৃ. ৪০৮।

৪০. তদেব, : পৃ. ১৯৫।

অথবা,

‘‘চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা জায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই জার ঘটে তারা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন।।
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।
অনেকের অনুরোধ কেহ না করিহ ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি।।’’[৩২]

এই অলৌকিকতা বর্জন ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেব- দেবীদের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের ভিন্ন মানসিকতা তাঁর কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গের পাশাপাশি গুজরাটের অবস্থানকে কবি বিদ্রুপ করেছেন। এই বাস্তবতাবোধ তাঁর আধুনিক মনের পরিচয় দেয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যরচনায় অন্যান্য মধ্যযুগীয় কবিদের মতো রামানন্দ দেবীর কোন স্বপ্নাদেশ পাননি। তাঁর নিজের কথায় লোকহিতের আকাঙক্ষায় ও বন্ধুজনের উপরোধে তিনি কাব্যটি রচনা করেছেন। রামানন্দ ছিলেন শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের দণ্ডী গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী। ‘রামানন্দ যতি’ নামটিতে ‘যতি’ অংশটি সন্ন্যাসীসূচক। এই রামানন্দ নামটি তাঁর আসল না হওয়াই স্বাভাবিক। কাব্য মধ্যে কবি রামানন্দ রসিকতা করে সম্ভবত পৃষ্ঠপোষককে নিমাইচরণ রায় বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যে আছে—

‘‘নিমাই চরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায়
পুস্তকের নাম দোষো নাস।’’[৩৩]

কবি নিজেকে রামানন্দ গোস্বামীও বলেছেন। এসব দেখে মনে হতেই পারে যে সন্ন্যাসী হওয়ার সময় তিনি আনন্দান্ত নাম গ্রহণ করে থাকতে পারেন এবং প্রিয় দেবতা রামকে নামাগ্রে ধারণ করে হয়তো সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর রামভক্তির বহু নিদর্শন কাব্যের বিভিন্ন পংক্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আসলে মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন। সেকারণেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ফুল্লরা বিপদ থেকে উদ্ধারের হেতু চণ্ডীকে স্মরণ না করে বহ্নি রূপী কৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন—

''খুলনা বলেন প্রভু না কর্য্যো বিচার।
আজ্ঞা হয় যে পরীক্ষা করি আর বার।।
বহ্নি রূপী কৃষ্ণ মোরে করিবেন পার।।''[৩৪]

কাব্যমধ্যে বর্ণিত স্থাননাম ও নদ-নদীর উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় কবি সম্ভবত রাঢ় বঙ্গের মানুষ ছিলেন। 'রাঢ়' শব্দটির প্রয়োগও কাব্যমধ্যে বিভিন্ন স্থানে রয়েছে—

১. ''রাঢ় দেশে ঘর বৈদ্য মহীশ্বর
বিক্রম কেশরী রায়।''[৩৫]

২. ''গঙ্গায় পড়িল ডিঙ্গা কাটোয়ার ঘাটে।
দামোদর দাপটেতে দুই দিক ফাটে।''[৩৬]

রামানন্দের 'চণ্ডীমঙ্গলে' উল্লেখ আছে দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত ছিলেন গায়েন এবং বন্ধু। কাব্যে উল্লেখ আছে—

১. ''দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত কহে সকলের হিত।
বিপরীত না ভাবিও করো শুদ্ধ চিত।।''[৩৭]

২. ''শুন বন্ধু কৃষ্ণকান্ত নিজ মন কর শান্ত
স্তুতি নিন্দা সব মায়াময়।।''[৩৮]

রামানন্দের প্রাপ্ত পুথিতে কৃষ্ণকান্তের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে উঠে এসেছে এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে যে খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায় তা আসলে গায়েনের হস্ত লিখিত। সম্ভবত কৃষ্ণকান্ত তায় আত্মপরিচয় বিবৃত করেছেন—

''যখন বয়স হৈল সপ্তম বৎসর।
বসিয়াছিলেন আম্রবনের ভিতর।।
প্রচণ্ড বৈশাখ মাস রবি খরতর।
আকাশের শব্দ শুন্যা উদাস অন্তর।।
ভাবিলেন কে আমি ছিলাম বা কোথায়।
মর‍্যা বা সকল লোক কোথা চল্যা যায়।।
কতকাল আমি বা থাকিব এই ঠাঞি।
পূর্ব্বে আছিলাম কোথা তাহা মনে নাই।।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হয়।
বন্ধুগণে তখন আসিয়া ধর‍্যা লয়।।
কহিলেন আপনার অন্তরের কথা।
শুনি সবে শান্ত করি রাখিলেক তথা।।
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কাল যায়।
একদিন একজন কহিল উপায়।।
সন্ন্যাস করিলা তুমি জানিবা সকল।
নিস্তারের কথা শুন্যা মনে হৈল বল।।
বন্ধ মোক্ষকারে বলে তাহা না জানেন।
কিন্তু স্বপনের মত মুক্তিটি মানেন।।
অন্তরের কথা কিছু কহিতে নারেন।
মুক্ত হওয়া ভালো ইহা বূঝিতে পারেন।।
কোথা হৈতে অকস্মাৎ দুজনা সন্ন্যাসী।
উপনয়নের দিন উপনীত আসি।।
দীক্ষা করাইয়া তাঁর করিলা গমন।
সন্ন্যাসী না দেখিয়া ব্যাকুল হৈল মন।।
দ্বাদশ বৎসরে হৈল আগমেতে দীক্ষা।
জপ যজ্ঞ যোগেতে হইল অতি শিক্ষা।।
অন্ন ত্যজ্যা ফলমূল করেন আহার।
গয়া কাশী প্রয়াগ করিয়া যোগ সার।।
সন্ন্যাস করিতে সবে করিলে নিষেধ।
বেদান্ত পড়িয়া করিলে মায়াছেদ।।
উত্তর দেশেতে তবে করিলা প্রয়াণ।
জঙঘাপীঠ ফুল্লরা পর্বত আদি জান।।
কত কত মহারণ্যে করেন ভ্রমণ।
মহিষ গণ্ডার হস্তি না করে হিংসন।।

কামরূপে কিছুকাল করিলেন বাস।
আজ্ঞা পায়্যা উড়িষ্যাতে করেন সন্ন্যাস।।
গৌড় দেশে আগমন জ্ঞান দান দিতে।
এমন দয়ালু কেবা দেখ্যাছে কলিতে।।
দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত কহে সকলের হিত।
বিপরীত না ভাবিও করো শুদ্ধ চিত।।''[৩৯]

সমকালীন সমাজের চিত্রপট নির্মাণে রামানন্দ অনেকটাই শিথিল। রামানন্দের কাব্যে ভাঁড়ু দত্ত একেবারেই আলাদা। কলিঙ্গ রাজের কাছে কালকেতুর নতুন রাজা হওয়ার খবর নিয়ে সে তিনশো সৈনিক চেয়ে নিয়েছে। তারপর এই সৈনিকদেরই ছদ্মবেশে পাঠিয়েছেন কালকেতুর দরবারে। প্রথম একশোজন এসেছে অশ্বারোহীর ছদ্মবেশে, এরপর পঞ্চাশজন এসেছে ঘোড়ার ব্যবসায়ী হয়ে। পরের পঞ্চাশজন হলো অস্ত্র বিক্রেতা। বাকি একশো জনের কেউ সেজেছে ভিক্ষুক কেউবা গৃহবিপ্র। ভাঁড়ু নিজে কালকেতুর কাছে এসে বলে—কলিঙ্গরাজ তাকে পাঠিয়েছে কালকেতুকে পরম সমাদরে রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। কালকেতু প্রথমে রাজী হয়নি। কিন্তু ভাঁড়ুর দলের ছদ্মবেশী সৈন্যরা তাকে যেতে বলে—

''ভাড়ু দত্ত কয় শুন মহাশয়
আমরা লোক রাজার।''[৪০]

শেষে ফুল্লরা অনুরোধ করায় ভাঁড়ুর পাঠানো ছদ্মবেশী সৈনিকেরা কালকেতুর সঙ্গে যাত্রা করলো। পথে এই সৈন্যরাই কালকেতুকে বন্দী করলো। রামানন্দ ভাঁড়ু দত্তকে এক ষড়যন্ত্রকারী চরিত্ররূপে নির্মাণ করেছেন।

কালকেতু বা ফুল্লরা চরিত্রেও বাস্তবিকতার অভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে পার্থিব জীবনরস অনুভব করা যায় না। মুকুন্দের জীবনরস বর্ণনাকে রামানন্দ 'কুরস' বলে অভিহিত করেছেন। আধ্যাত্মানুভূতির গভীরতা, ভক্তিরসের প্রাবল্য ইত্যাদির কারণে রামানন্দ চিরকাল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক ভক্তকবি রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

**তথ্যসূত্র :**


১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৬।

২. Bajerjea, J.N. : Ibid, p. 491.

৩. ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭, পৃ. ৪২।

৪. রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, এপ্রিল, ২০১৪, (দেবীচণ্ডী : অনার্য উৎস - বিনয়কুমার মাহাতা), পৃ. ৪১।

৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৪৬।

৬. Whitehead, H. : The villages of south India (Calcutta, 1921), 29 80, 81, 83.

৭. Risley, H. H. : Tribes and Caste of Bengal, Vol. I (Calcutta, 1891), p. 359.

৮. মণ্ডল, সন্দীপকুমার : (ভাষা-পাঠান্তর-টীকা), শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৪৩।

৯. ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পাদিত) : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, ভূমিকা অংশ।

১০. তদেব, : পৃ. ৩৪।

১১. তদেব, : পৃ. ৩৫।

১২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪।

১৩. চক্রবর্তী, রজনীকান্ত : মানিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডী, সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, সম্পাদক - নগেন্দ্রনাথ বসু, একাদশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৩১১, পৃ. ৩৫।

১৪. ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পাদিত) : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃ. ২৭৬।

১৫. চক্রবর্তী, হরিপদ : কবি মানিক দত্ত প্রসঙ্গে : সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, ভূমিকা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, প্রবন্ধ অংশ।

১৬. ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) : মঙ্গলচণ্ডীর গীতা, দ্বিজ মাধব, কবি-প্রসঙ্গ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভূমিকা অংশ।

১৭. তদেব, : পৃ. ৭।

১৮. তদেব, : পৃ. ভূমিকা অংশ, কবি প্রসঙ্গ।

১৯. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২০. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলকাতা - ৭৩, পৃ. ৩৯৩।

২১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুথি, ৭০ (ক)।

২২. তদেব, : পৃ. ১০৬ (ক)।

২৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।

২৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৭। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথি ৫১ খ - ৫২ খ)

২৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৩৯৮।

২৬. দাস, আশুতোষ (সম্পাদিত) : অভয়ামঙ্গল-দ্বিজ রামদেব (ভূমিকা অংশ, কবি পরিচয়)।

২৭. ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৫৪৩।

২৮. তদেব, : পৃ. ৩৮।

২৯. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ৪০১।

৩০. তদেব, : পৃ. ২০০।

৩১. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩২. তদেব, : পৃ. ১০২।

৩৩. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩৪. তদেব, : পৃ. ২৪৬।

৩৫. তদেব, : পৃ. ২১৫।

৩৬. তদেব, : পৃ. ২৫৫।

৩৭. তদেব, : পৃ. ৪০৯।

৩৮. তদেব, : পৃ. ৪১০।

৩৯. তদেব, : পৃ. ৪০৮।

৪০. তদেব, : পৃ. ১৯৫।